ধারাবাহিক রচনা

স্বামীজীর ‘হিন্দুধর্ম’ বক্তৃতা

পূর্বা সেনগুপ্ত

(নভেম্বর ২০১৯ সংখ্যার পর)

প্রশ্ন হতে পারে, একটি ধর্মতত্ত্ব—তা পাপবাদই হোক বা পূর্ণতার দ্যোতকই হোক—সমাজে কি কোনও প্রভাব ফেলে? তত্ত্ব মানুষের মনকে তৃপ্ত করে মাত্র! কিন্তু না, সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন ধর্মতত্ত্ব সমাজকে পরিচালিতই শুধু করে না, সমভাবে সেটি সমাজের পরিবর্তন সাধনেও সক্ষম। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছেন, সেমিটিক ধর্মের পাপবাদ ও তারই সঙ্গে জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাস এই ধর্মভুক্ত মানবসমাজের মনোজগতে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল। ধর্মতত্ত্বের ফলে মানুষ জেনেছিল আমরা জন্মগতভাবে পাপী, কারণ আদম ও ইভ যে-পাপ করেছিলেন তার থেকেই আমাদের সৃষ্টি। সুতরাং আমাদের স্বর্গে যেতে হলে ভাল কর্ম করতে হবে। ভ্রান্তিও চরম শাস্তি এনে দেবে কারণ এই জীবনের শেষে আর জীবন লাভ করা যাবে না, ভাল কাজ করলে স্বর্গলাভ হবে আর মন্দকাজ করলে নরক। এই স্বর্গ ও নরকে অবস্থান চিরকালের জন্য। এর থেকে মুক্তি নেই। যুধিষ্ঠিরের মতো একবার মিথ্যাভাষণের জন্য নরকদর্শন করিয়ে অন্তে স্বর্গলাভ—এ-নিয়ম সেমেটিক ধর্মে নেই। তাই মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে ‘নরকজন্ম থেকে মুক্তির উদ্বেগ’ (salvation anxiety)। এই মানসিকতাই সেমেটিক ধর্মভুক্ত মানুষকে প্রচণ্ড কর্মপর করে তুলেছিল এবং সমাজে এসেছিল পরিবর্তন। সমাজে সূচনা হয়েছিল ধনতন্ত্রের (Capitalism)।

অপরদিকে হিন্দু জানে—একটি দোষে আমার কিছুই হবে না, আমি কর্ম অনুযায়ী ফল পাব কিন্তু এগিয়ে যাব ধীরে ধীরে, নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পাব। তাই হিন্দুমন ধর্মবিষয়ে, সামাজিক অবস্থান বিষয়ে উদ্বেগশূন্য। ধর্মবিষয়ে তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস জানায়, পাপবাদ ধর্মের মধ্যে বিকৃতি এনেছিল, ক্যাথলিক চার্চের যাজকগণ ‘ইনডালজেন্স’-এর প্রবর্তন করে পাপ থেকে মুক্তির সার্টিফিকেট দিতে লাগলেন অর্থের বিনিময়ে। স্বর্গপিপাসু মানুষের অর্থে চার্চ যত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হতে লাগল, ততই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দুর্বল হতে শুরু করল। ধর্মক্ষেত্রে এল বিকৃতি। খ্রিস্টধর্ম ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট—দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। শিকাগো ধর্মমহাসভায় যখন স্বামীজী এই ‘অমৃতত্বে’র তত্ত্ব প্রদান করলেন তখন বাস্তবিকই নরকের আগুনের মধ্যে যেন শীতল জলবৃষ্টি হল, স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়

সত্যদ্রষ্টার শ্রীমুখে সমগ্র বিশ্ব শুনল অমৃতত্বের কথা। কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নিজেদের পায়ের তলার মাটিটি খুঁজে পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন এক দিগ্‌দর্শন—যেটি, 'দ্বিধা' 'কিন্তু' ইত্যাদি শব্দগুলির পরিবর্তে এক ধ্রুবতারাকে যেন চিহ্নিত করল। উজ্জ্বল সেই নক্ষত্রকে স্থিরবিন্দু করে কলম্বাস হল থেকে শুরু হল যাত্রা। আত্মার এ-অভিযান ঘটল নীরবে। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির ভূমিকায় এক খ্রিস্টান— মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল লিখলেন, ''Of the Swami's address before the Parliament of Religions, it may be said that when he began to speak it was of 'the religious ideas of the Hindus', but when he ended, Hinduism had been created. The moment was ripe with this potentiality."

বেদ, ঋষি, আত্মা, আত্মার এক দেহ থেকে ভিন্ন দেহে গমন—অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ, একটি একটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতি সূক্ষ্ম ভাবে ও যুক্তিতর্কের সিদ্ধান্তের আঙ্গিকে স্বামীজী হিন্দুধর্মের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যক্ত করেছেন। তারপর এই ধর্মের আরও কিছু বিশেষ গুণাবলির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়েছেন বিদেশি শ্রোতাদের। এই বিষয়গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল পৌত্তলিকতার ধারণা। তৎকালে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে এটাই ছিল প্রধান অভিযোগ। স্বামীজী ধীরগতিতে সেই সমালোচনার উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। স্বামীজী বলেছেন, যে-তাত্ত্বিক ক্ষেত্রগুলির কথা ব্যক্ত করলেন তার মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। সিদ্ধান্ত হল—এ-জগৎ কোনও নিষ্ঠুর নির্মম ভয়াবহ নিয়মাবলির প্রবাহ বা নির্মম ঈশ্বরের মাধ্যমে শাসিত নয়, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে আছেন এক মহাপুরুষ, একজন নিয়ামক, যাঁর আদেশে বায়ু প্রবাহিত হয়, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, মেঘ বারিবর্ষণ করে। সেই পুরষের স্বরূপ কী? স্বামীজী বলছেন, তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, সকলের উপরেই তাঁর পূর্ণ দয়া। সেমিটিক ধর্ম বলে, তিনি স্বর্গস্থ পিতা, তুলাদণ্ড নিয়ে বসে আছেন। আমাদের পাপ আর পুণ্যের হিসেব তাঁরই হাতে। কিন্তু হিন্দুগণ বলেন, তিনি পিতা হতে পারেন, তবে তিনি মাতাও, তিনিই আমাদের পরম প্রেমাস্পদ। তিনি ন্যায়-অন্যায়ের নিক্তি নিয়ে বসে নেই, তিনি প্রেমস্বরূপ। তাঁর পূজার উপকরণ ভয় বা ভীতি নয়, বরং তার বিপরীত—প্রেম, ভালবাসা! প্রেম ও প্রীতি দিয়েই তাঁকে পূজা করতে হয়। অর্থাৎ উপকরণ ও ভাবের ক্ষেত্রেও হিন্দুধর্ম যে পৃথক তা স্পষ্ট ভাষায় স্বামীজী ব্যক্ত করলেন।

সেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম কেমন হবে? তা হবে নিঃস্বার্থ! এক্ষেত্রে স্বামীজীর কথায় শ্রীকৃষ্ণ ও শুদ্ধাভক্তির প্রসঙ্গ এসেছে সহজেই। সঙ্গে এসেছে যুধিষ্ঠিরের কাহিনি। জ্ঞাতিশত্রুতার ফলস্বরূপ পঞ্চপাণ্ডব হিমালয়ের পাদদেশে কোনও বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এইসময় রানি দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি সর্বচেয়ে ধার্মিক, আপনাকে কেন এত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে?'' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন, ''পর্বত আমাকে কিছুই দেয় না, তবু সুন্দর ও মহান বস্তুকে ভালবাসাই

আমার স্বভাব, তাই আমি হিমালয়কে ভালবাসি। ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এইজন্য ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার একমাত্র পাত্র।"

যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি উল্লেখ করেছেন স্বামীজী। উল্লেখ করেছেন বিদেশি শ্রোতাদের কাছে, যাঁরা অধিকাংশই সেমেটিক বা খ্রিস্টীয় ধর্মভুক্ত হওয়ার ফলে ঈশ্বরকে স্বার্থপূর্ণ ও কঠিন শাসকের মতো ভীতির সঙ্গে উপাসনা করেন। তাঁদেরকে স্বামীজী দিলেন ভারতের শুদ্ধাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, নিঃস্বার্থ প্রেমের ভাবনা। শিকাগো বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতাদের তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থানটি কেমন ছিল তা যেন কল্পনা করা যেতে পারে। তাঁরা ভীতির ধর্ম থেকে আনন্দের ধর্মে, প্রেমের ধর্মে উন্নীত হয়েছিলেন। মানবিক প্রেম যে স্বর্গীয় প্রেমেরই ক্ষুদ্ররূপ তা তাঁদের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সত্য-সত্যই ভালবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব—একথা জেনে তা নিয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিত শুরু হয়েছিল। আর স্বামীজী প্রবেশ করেছিলেন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

পৌত্তলিকতা ও বহু-ঈশ্বরবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ধর্মকে পৌত্তলিকতা ও বহু-ঈশ্বরবাদের জন্য সর্বাধিকভাবে সমালোচিত হতে হয়েছিল। ভারতীয়গণ বহুরূপে পূজা করেন কিন্তু বহু-ঈশ্বরবাদ সেটি নয়। স্বামীজী এ-বিষয়ে অসাধারণ একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন : ''ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ নাই। প্রতি দেবালয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে শুনিতে পাইবে পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ এমনকি, সর্বব্যাপিত্ব পর্যন্ত আরোপ করিতেছে। ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন দেব-বিশেষের প্রাধান্যবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইবে না।"

অর্থাৎ একটি বিগ্রহ বা প্রতীকে সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের আরাধনা করা হচ্ছে। প্রতীক যাই হোক না কেন, তার মাধ্যমে সর্বব্যাপী ঈশ্বরকেই পূজা করা হচ্ছে। সুতরাং বিগ্রহভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বরত্ব এক। কোনও একসময় এক ভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ''এই যে খুঁটিটি দেখছ, এর ভিতর ভগবান আরোপ করতে পারলেও ভগবান লাভ হতে পারে।" অর্থাৎ মূর্তি গৌণ বিষয়, তা অনন্ত ভাবময় এক ঈশ্বরের প্রতীকমাত্র। যার যেমন প্রতীক পছন্দ সে তেমন প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে অনন্ত অভিমুখে ধাবমান। তবু প্রতীকপূজার সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে স্বামীজী উদাহরণরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে এনেছেন : ''ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন সব মানুষ আছেন, যাঁহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় : পাপ হইতে কি কখনও পবিত্রতা জন্মিতে পারে?"

এখানে প্রশ্ন আসে, যখন এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরই আমাদের আরাধনার বিষয়, তবে এত বিচিত্র মূর্তির প্রয়োজন কী? কিংবা মূর্তি বা বিগ্রহের দরকারই বা কী? খ্রিস্টান মিশনারিগণ এই সমালোচনার মূল উৎস ছিলেন। তাই স্বামীজী তাঁদের প্রতিই আক্রমণ করে বসলেন দৃঢ়ভাবে। কারণ তাঁরা সংকীর্ণ মনোভাবের অধীন হয়ে এই সমালোচনা করেন। তাঁরাও বিগ্রহের সাহায্য ব্যতীত আরাধনায় এক পাও অগ্রসর হতে অক্ষম। স্বামীজী বলছেন, ''কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ। [আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী,] তবে খ্রিস্টানরা কেন গির্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মূর্তি রহিয়াছে কেন? প্রোটেস্টান্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আবির্ভাব হয় কেন? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ,

নিশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময় রূপবিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব।... 'সর্বব্যাপী' শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদিত হয়, এই পর্যন্ত।"

অতএব মানুষের মনের স্বভাবই এই যে, অনন্তের ভাব উপলব্ধি করতে গেলে অসীম সমুদ্র বা বিরাট আকাশ মনের মধ্যে এসে পড়ে, আবার কারও কারও ঠিক সেইরকমই গির্জা, ক্রুশচিহ্ন, মসজিদ ইত্যাদি মনের মধ্যে এসে যায়। হিন্দুরা কেবল সেই ভাবকে একটি বিগ্রহের রূপদান করেছেন মাত্র। তবে স্বামীজী এর মধ্যেও একটা প্রভেদ খুঁজে পেয়েছেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে ক্রুশচিহ্ন বা মসজিদেই সীমাবদ্ধ রাখেন। একজন হিন্দু কিন্তু নিজের ধর্মাচরণকে কেবল বিগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁর আরাধনা ক্রম-উন্নতির পথ ধরে সাকার থেকে নিরাকারের দিকে ধাবিত হয়, দ্বৈত থেকে অদ্বৈত অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্রম-উত্তরণের কথা আর কোনও ধর্মে বলা নেই।

স্বামীজী বললেন, ''কেহ যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্যভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে কি উহাকে পাপ বলা সঙ্গত? সাধক যখন ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে। হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার—উপলব্ধি করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। অতএব প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান সূর্যে উপনীত হয়।"

বহু-ঈশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতাকে যথার্থ রূপ অনুযায়ী উপস্থাপিত করার পর স্বামীজী তীব্র ভাষায় ভারতীয় ধর্মের প্রতি মিশনারিদের প্রচারিত কুৎসার জবাব দিয়েছিলেন। যদিও বক্তৃতার এই অংশগুলিতে হিন্দুধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত নেই, তবু এই সমালোচনা আমাদের মূর্তিপূজার প্রতি

সমালোচনাকে বুঝতে সাহায্য করে। স্বামীজী বলছেন, ''ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা বলিলে ভয়াবহ একটা কিছু বুঝায় না। ইহা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়, বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ। হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করিও, তাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু —চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজ্বলিত করে না; ইহাকে যদি তাহার দুর্বলতা বলো, সে দোষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর দোষ খ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।''

এই পঙ্‌ক্তি কটি পাঠ করতে করতে আমরা বুঝতে পারি, এক পরাধীন দেশ থেকে আগত এক নিঃসম্বল তরুণ সন্ন্যাসী সেই বিদেশিদের সভায় কেবল নিজের ধর্মকে ব্যাখ্যা করছেন না, উপরন্তু মিশনারি-কৃত সমালোচনার যোগ্য জবাবও দিচ্ছেন স্পষ্ট ভাষায়। সেখানে তিনি কোনও আপস করেননি।

ভারতবর্ষ মূর্তিপূজা থেকে অদ্বৈততত্ত্ব পর্যন্ত প্রতিটি ভাবকে কেন সত্য বলে ঘোষণা করেছে? স্বামীজী বলছেন, ''কারণ বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা।'' বহু মানুষের বহু রুচি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যে যার রুচি অনুযায়ী সাধনপথে অগ্রসর হবে। প্রত্যেকের জন্যই পৃথক পথ হতে পারে, লক্ষ্য কিন্তু এক। স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, ভারতে সামাজিক ব্যবস্থায় কোনও স্বাধীনতা নেই, কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া আছে। আবার পাশ্চাত্যে ধর্মক্ষেত্রে কোনও স্বাধীনতা নেই, কিন্তু সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খুব কদর। স্বামীজী সুন্দর উপমা দিলেন : ''অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা একমাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন : আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ সম্ভব; এবং প্রতিমা, ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ।''

সার্বভৌমিক ধর্ম

'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতায় স্বামীজী মূর্তি আরাধনা থেকে অদ্বৈতবাদের উপস্থিতি—এই বৈচিত্র্য যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি একই যুক্তিতেই সর্বধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও সত্যতাকে স্বীকার করে একটি সর্বজনীন ধর্মের কথাও ব্যক্ত করেছেন। স্বামীজী বলছেন, ''একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া আসিতেছে। সকলের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সামান্য বিভিন্নতা প্রয়োজন। কিন্তু সব কিছুরই অন্তস্তলে সেই এক সত্য বিরাজমান।''

এর সঙ্গে স্বামীজী আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, ''আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নয়। ব্যাস বলিতেছেন, 'আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।' ''

অবশেষে স্বামীজী আশা প্রকাশ করেছেন, ''যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাহারই মতো অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্রীষ্টভক্ত, সাধু অসাধু—সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার

করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে...।"

স্বামীজী সেই সার্বভৌমিক ধর্মের কথা বলেছিলেন যেখানে কারও প্রতি বিদ্বেষভাব থাকবে না, থাকবে না উৎপীড়নের ভয়। সে-ধর্মে প্রত্যেক নরনারীকে দেবস্বভাবসম্পন্ন বলে স্বীকার করা হবে এবং সেই ধর্মের সমস্ত শক্তি সকল মানুষকে তার দেবস্বভাব উপলব্ধি করাতে সাহায্য করবে। স্বামীজী উল্লেখ করেছেন, ''এই প্রকার সার্বজনীন ধর্ম গঠনের চেষ্টা কেবল বৌদ্ধধর্মের অশোকের ধর্মসভাতে হয়েছিল। আকবরের 'দীন-ইলাহি' একটি গৃহ বা সভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 'সমস্ত ধর্মেই ঈশ্বর আছেন'—একথা বলার ভার আধুনিক যুগে আমেরিকার হাতেই ন্যস্ত হয়েছে।

''যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টানদের 'স্বর্গস্থ পিতা', তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কার্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন।"

'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতার মধ্যে স্বামীজী কোথাও ভ্রান্তিবশতও তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেননি, কিন্তু হিন্দুধর্মের সামগ্রিক সত্তাকে ধর্মসভায় উপস্থাপিত করার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে সম্প্রসারিত করেছেন সর্বজনীন ধর্মভাবনার মাধ্যমে। তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত ধর্মভাবনাকেই তুলে ধরেছেন। নীরবে গুরুকে বাণীরূপে, আদর্শরূপে, ভবিষ্যৎ যুগের ধর্মবেত্তা-রূপে, যুগাবতাররূপে ও অবতারবরিষ্ঠরূপে নবালোকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। শিকাগো বক্তৃতাবলির মধ্যে তাঁর প্রদত্ত 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতাটি তাই সনাতন হিন্দুধর্মের সম্প্রসারিত রূপ। এই রূপের মধ্যে কোনও দেওয়াল নেই, আছে সর্বগ্রাহ্যতা। ধর্মের ইতিহাস, বিবর্তন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় এই অতুলনীয় বক্তৃতা হিন্দুধর্মের মধ্যে উদারতা ও সচলতার বৈশিষ্ট্যটিকে প্রতিষ্ঠা করে। পাঞ্চজন্যধারী শ্রীমধুসূদন ভয়াবহ আত্মীয়ঘাতী যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সখা পার্থকে যুগধর্ম বর্ণনা করে গিয়েছিলেন, এযুগেও সেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বহুধর্মমতের পরস্পর বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ শুনিয়েছিলেন 'হিন্দুধর্ম' ও তার সম্ভাব্য আধুনিক রূপরেখাটিকে। এতে কেবল হিন্দু নয়, প্রতিটি ধর্মমতের মানুষ তার কাম্যপথ খুঁজে পেয়েছিল, সমগ্র পৃথিবী পেয়েছিল এগিয়ে চলার নতুন বার্তা।

সমাপ্ত

সহায়ক গ্রন্থ

১। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ১, ৯

২। Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Trans. by Talcott Parson (1930)

৩। Max Weber, *Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism,* Trans By Hans Gerth and Don Martindale, (The Free Press, 1958)